বাসুদেব দেব

This is the first book by poet Basudeb Deb (1936 -2012)
Basudeb Deb, an exemplary poet of bengali literature had choosen to walk in a different pathway. He had contributed to bengali literature through his poetry, prose, novel, drama , short stories & essays. From Basudeb Deb Academy we are uploading his works through google book. Thanks google.
Contact :basudeb.deb.sansad@gmail.com

একটা গুলির শব্দে

বাসুদেব দেব

াকিল ৫
৮
১২
গোলাপ ১৪
না ১৬
১৭
১৯
াদয় ২২
কলবেলা ২৪
তমা ২৬
ক ২৯
াপী চুল ৩২
ঘরে ৩৪

প্রথম প্রকাশ
শরৎ ১৩৭৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

*

প্রকাশক ও মুদ্রক
রথীন হালদার
কনক আর্ট প্রেস
দিঘীরপাড় বাজার, ২৪ পরগণা।

*

পরিবেশক
গ্রন্থ নিলয়
৪৮/১, মহাত্মা গান্ধী রো
কলিকাতা ৯

*

মীরা দেব কর্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

*

প্রচ্ছদ
অরুণলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

*

মূল্য দুটাকা

সূচীপত্র

অস্থির দর্পণে ১
এ ঘর থেকে ওঘর ২ সূর্যমুখী ৩ টেলিগ্রাম ৪ সময়ের চতুরকোকিল ৫
বন্ধুদের প্রতি ৬ জতুগৃহে ৭ তুড়িদিলে ৭ দুটো শালিক ৮
নিষ্ফল বিষাদ ৮ বিসর্জনের আগে ৯
শীতের বিকেল ১০ হঠাৎ ডেকে ১০
গুণিনের বীণা ১১ ঝড়েও নেভেনা ১১ বিমল আলোর কাছে ১২
অলৌকিক বীণা ১২ নিয়তিকে ১৩ জীবনবাবুকে ১৩ চড়ুই ও কাঠগোলাপ ১৪
তোমাদের দেরী দেখে ১৫ দুপুরবেলা ১৫ আমাকে ডেকো না ১৬
লিজের প্রস্তাব ১৬ অন্ধকারের গন্ধরাজ ১৭ প্রতীক্ষায় আছি ১৭
মেঘের দিনে গন্ধরাজ ১৮ চাঁপার গন্ধে ১৮ চড়ুইভাতির পর ১৯
নগরী নির্জ্জন ২০ ভালোবেসে ২১ মাছখেলা ২১ বুকে নিয়ে সূর্যোদয় ২২
তিস্তা-তীর বাসীকে ২২ ঝড়ের পরে বৃষ্টিধারা ২৩ গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা ২৪
আশ্রয় প্রার্থনা ২৪ দাঁড়ের ময়না ২৫ ঝাউবন ২৫ সন্ধ্যার প্রতিমা ২৬
নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর জন্য ২৭ সিঁড়ি নেই ২৮ মধ্যরাতের সংলাপ থেকে ২৯
দরজায় ৩০ ইনসমনিয়া ৩০ কীর্তিনাশার ধারে ৩১ সারাবিকেল গোলাপী চুল ৩২
মণিমালা ৩২ হে আমার রাণী ৩৩ অসতর্ক নারীকে ৩৪ ধ্বনিময় জ্বরে ৩৪
একটা গুলির শব্দে ৩৫ স্বগতোক্তি ৩৬ শেষ চার মিনার ৩৭
লণ্ঠন জ্বালাতে ৩৮ বিকালের আলো দেখলে ৩৯
ট্রানজিস্টার মেঘলাদিনে ৪০ ভুল খবর ৪১
একটি শিশুর জন্মকালীন ৪১
কালিঝোরা ৪২

রচনাকাল
১৩৭০ থেকে ১৩৭৩

Ekta Goolir Shabdē

BASUDEB DEB

২৬ পৃষ্ঠায় কুহকস্থলে কূহক, ২৭ পৃষ্ঠায় আশ্চর্যের পরিবর্ত্তে আশ্চার্য, ৩০ পৃষ্ঠায় উট হাঁটতের বদলে উঁট হাটতে এবং হয়তো অন্যত্র এইরকম আরোকিছু মুদ্রন প্রমাদ রয়ে গেছে। এ জন্য আমরা মার্জনা প্রার্থী—প্রকাশক॥

অস্থির দর্পণে॥

নির্জন সরলরেখায় হেঁটে গেছে সে যুবক,
সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে। ছায়া ক্রমে বলীয়ান। ঢেউয়ের ওপর
টালমাটাল নৌকো—দূরে কয়েকটি নিথর আলোক
স্বপ্নে : বাতায়নে কেউ আছে প্রদীপের মতো চোখ জ্বেলে।

শুধুই জলের শব্দ—জল ; ছলছল—রাখে না সে
কোনো দাগ সুস্থির বিশ্বাসে—শান্ত অন্ধকারের
কান্ত করকমলেষু কয়েকটি জ্যোতির্ময় কথা।
দুঃখের বিচিত্র বর্ণে প্রেমিকের মুখচ্ছবি আঁকা।

জটিল অরণ্যে এক বিমুগ্ধ হরিণ কুয়াশায়
জলের কল্লোল শুনে তৃষ্ণাতুর। মুক্তির সন্ধানে
বিভ্রান্ত বিশ্বাসে শেষে ব্যাধের শিকার। অই
অস্থির দর্পণে তুই কার মুখ দেখবি রে যুবক ?

এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে ॥

এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে
যেতেই আমি বুড়িয়ে গেলাম।
বুড়িয়ে গেলাম, ফুরিয়ে গেলাম,
দিনের শেষ মুঠোয় পেলাম
খানিক ছাই, আগুন কিছু।
হঠাৎ ভুলে চাইলে পিছু
আঁধার ঘরে সেতার বাজে
স্মৃতি-ছবি হচ্ছে নিলাম।
এ ঘর আলো, ও ঘর আঁধার—
দুই পুরের-ই সুর মেলালাম।
এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে
যেতেই আমি বুড়িয়ে গেলাম।
বুড়িয়ে গেলাম, জুড়িয়ে গেলাম,
আলো-ছায়ার এ পেণ্ডুলাম
জ্যোৎস্না-রোদ-শিশির মেখে,
ছাইয়ের তলায় আগুন ঢেকে
দুলছে কতো, ভুলছে কতো—
সেই আগুনেই দগ্ধ হলাম।
এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে
যেতেই আমি বুড়িয়ে গেলাম।

সূর্যমুখী ॥

মহাশয়, বিরক্ত পাঠক,
একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করি।
'আছেন ভালো ?' সব ব্যাটাই ঠক—
এখন শুধু কলসী এবং দড়ি।

টিকেট কাটা আছে তো সিনেমায় ?
বেশ বেশ, ঘণ্টা তিনেক ইচ্ছে
মতন রাজ্যে বেশ তো ঘোরা যায়,
সব অসুখের নেই তো চিকিচ্ছে।

অফিস ঘরে ঠা-ঠা দুপুরবেলা,
মনে পড়ে কমল দিঘির ঢেউ ?
জাফরিকাটা আলো ছায়ার খেলা,
বয়স ভাড়িয়ে খেলছে তো কেউ কেউ।

অনেক রাতে গ্যাসের বাতি নীল।
বুকের ব্যথা বাড়লো নাকি ? আহা !
ঘুমের মধ্যে খোঁজা আরাম পিল,
অনেক কিছুর হয় না তো সুরাহা।

যাত্রাদলের অভিমন্যু সাজা,
জামা খুললে গেঞ্জি বহুমুখী।
বুকের ভাঙ্গা কপাট খুললে তাজা
আছে কি সেই দিব্য সূর্যমুখী ?

টেলি গ্রাম ॥

'তোকে খুন করে ফেলব, একদম খুন'।

দরজা বন্ধ করে আসতে
আসতে দেখি কবে—
দস্যুরা গিয়েছে চলে ধুলো পায়ে
বিছানায় রেখে
একরাশ রক্তমাখা ফুল। (আগুন, আগুন...)
নেপথ্যে শিশির ঝরে সবুজ পল্লবে,
আমি খুন হতে থাকি, প্রতিদিন খুন।
নাম ধরে ডেকে
উত্তর না নিয়ে কারা চলে যান্, শুনুন, শুনুন...।

এলবাম খুলি না ভয়ে, হতচ্ছাড়া যৌবন স্মৃতিরা
হঠাৎ সনাক্ত হয় যদি!
মেঘের গোলাপ ঝরে; লাল-নীল হলুদ-মেরুন...।
চশমা খুলে তাকাতেই খড়খড়ির ফাঁকে
দেখি কারা শবাধার নিয়ে ধীরে চলে যাচ্ছে ঐ,
শান্ত পায়ে টেলিগ্রাম নিয়ে আসছে শীতের পিওন,
অনিবার্য মৃত্যুমঞ্চে একটি রক্তিম ফুল,
মহাশয়, করুণা করুন।

(প্রতিধ্বনি: ক রু ন...ক...রু... ...ন...)

সময়ের চতুর কোকিল ॥

সময়ের চতুর কোকিল কখনো বা জেগে ওঠে উষ্ণ বাতাসের
করস্পর্শে। তখন আমার বড়ো ভয়
বড়ো ভয় করে। বিশেষত
কৃষ্ণচূড়া শোভিত আকাশ
যখন পতাকা হয়ে নাচে।
লুণ্ঠনকারীকে বড়ো ভয় করি,
সর্বত্রই রাহাজানি সচল, সচ্ছল।
সময়ের চতুর কোকিল মেঘের স্তবক থেকে কখনো হঠাৎ
জেগে ওঠে বহুকাল পরে, রক্তে
হিম কুম্ভকর্ণ মরে গেলে। মনে পড়ে যায় ঐ হাওয়ায় ও
নিসর্গের কশাঘাতে: আমারও সাম্রাজ্য ছিল, অতুল বৈভব,
লাবণ্যপ্লাবিত অন্তপুর.....
মুহূর্তে অপরিতৃপ্তি-বিষে নীল তনু,
পরিতাপে জ্বলি।
সময়ের চতুর কোকিল জানি আবার মাথায় পায়ে
কাঠি বদলে, ঘুম পাড়িয়ে যাবে।
তাই এই ক্ষণিকের জাগরণ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদিকে ভয়,
বিশেষত জানা নেই পুষ্পিত কুঞ্জের শেষে কোন্‌খানে আছে
স্বখাত সলিল পদ্ম পাতায় আবৃত।
লুণ্ঠনকারীরা সব চলে গেলে রিক্ততার ধুলো চতুর্দিকে,
অসহায় মনে হয় রক্ত মাংস চেতনা কামনা ইত্যাদিকে,
পুনর্জন্মে বিশ্বাস শিথিল ॥

বন্ধুদের প্রতি ॥

বন্ধুগণ, এখনো সময় আছে,
এসো একবার, আরো একবার, সম্মিলিত হতে চেষ্টা করি
রক্তমেঘ পতাকার তলে। হৃতরাজ্য উদ্ধারের
শেষ চেষ্টা করে দেখি এসো।

'সর্বনাশ, সর্বনাশ' যূথভ্রষ্ট বন্ধু বান্ধবের আর্তনাদ—
আগুন, আগুন...ঢং ঢং...ছুটে যাচ্ছে দ্রুত দমকল।
চার্চের গম্ভীর ঘণ্টা অন্তিম বিষাদে বাজে ; হৃদয় বিদীর্ণ করে ঐ
দূরগামী জাহাজের বিদায়ী হুইস্‌ল। ম্যাটিনির সভা
ভাঙতে না ভাঙতেই সব ছুটে যাচ্ছে। অর্বাচীন ছেলে
একরাশ টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে চিল্লাচ্ছে কেমন !
ডবল ডেকার কাকে চাপা দিয়ে চলে গেল না[illegible]ই,
মূঢ় কনডাকটর তার গন্তব্য জানে না.. কেউ জানে না.. জানে না..

বন্ধুগণ, এখনো সময় আছে—
প্রেমিকার গাঢ় কেশ স্তবক শিখরে
একটি রক্তিম ফুল প্রতিশ্রুত—ভুলো না, ভুলো না।
হয়তো এখনি মূর্ছা ভেঙে
একলক্ষ রেডিও থেকে বেজে উঠবে দীপ্ত দৈববাণী :
বন্ধুগণ, এখনো সময় আছে,
দেখো অভিজ্ঞান—
হৃদয়ের ফুলদানে ঐ তো অম্লান
বিশ্বাসী সে গন্ধরাজ বিজয় প্রতিমা ॥

জতুগৃহে ॥

জতুগৃহে বসিয়ে রেখে কোথায় গেলে সব ?
দেয়াল-ভরা ঈশ্বরের ও নিসর্গেরই মুখ।
প্রাচীন সম্রাটের ছবি, শিল্প কারুকলা ... ...
কেউ জানে না কোথায় গেলে মিলতে পারে সুখ।

প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধকারে বিনষ্ট দর্পণ...
বনের শেষে আদ্যিকালের স্থবির পর্বত।
সেখান থেকে ঝর্ণা ঝরে, 'সুরের সুরধুনী...
কেউ জানে না আসবে কখন আলোর জয়রথ।

অম্ল দ্রাক্ষা ক্লান্ত আমার নিরুদ্যম শোক,
অলীক অপ্রাপনীয় শিখর থাক দূরে।
বিসর্জনের হোমশিখাতে সকল সজ্জা ফেলে
পালিয়ে যেতে হবে আমায় ঐ নিরাপদ পুরে ॥

তুড়ি দিলে ॥

তুড়ি দিলে এই মাত্তর
বীজ থেকে গাছ উঠবে, গাছ ভরে পাতা ফুল ফল।
তুড়ি দিলে ফাঁকা বাক্স ভরে যাবে রঙিন কাগজে।
এক ঝাঁক কবুতর বুক থেকে কেমন সহজে
উড়ে যাবে, অদৃশ্য রুমাল ওড়ালে অবিকল
চৈত্রের চাঁপার গন্ধ ভরে দেয় ঘর।
পকেটের তাস উল্টে দিলে দিব্যি রূপসীর মুখ—

এই সব সে মায়াবী মঞ্চে, তার পর
ভয়াবহ অন্ধকারে ভর করে অদ্ভুত অসুখ,
তুড়ি দিলে কিছু না, কিছু না, নড়ে না মাছিটি
মুখ থেকে। যা কিছু ছোঁবো তা অমনি পাথর।

বহুদিন পাই না যে নিমন্ত্রন চিঠি ॥

দুটো শালিক ॥

অনেকদিন আমি দুটো শালিখ দেখি না,
অনেকদিন
আমি স্বপ্নে ও দুটো শালিখ দেখি না।
অথচ সবুজ ঘাসে সোনালী রোদের রূপকথা
শুনতে ওরা
রোজ আসতো, রোজ, আমার বাগানে।

এখন কি ঘাস আর সবুজ নয়, রোদ সোনালী ?
ধুলো-বারুদ-ধোঁয়া
হাওয়ায় ? নাকি, পাখি দুটো উড়ে গিয়েছে, মরে গিয়েছে ?
আমার বড়ো অসুখ করেছে, সুধা আমার
বড়ো অসুখ করেছে,
দুটো শালিখ না দেখলে আর কোনও দিন সারবে না !

অনেক দিন আমি দুটো শালিখ দেখি না, সুধা,
অনেকদিন
আমি স্বপ্নেও কেন দুটো শালিখ দেখি না ?

নিষ্ফল বিষাদ ॥

আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে এক নিষ্ফল বিষাদ।
মাঝরাতে কদমের ডালে চাঁদ সুতো ছেড়া ঘুড়ির মতন
হঠাৎ বন্দিনী হলে, শেষ ট্রেন চলে গেলে...খা খা প্লাটফর্ম...
নীল কুলি ছাড়া আর কেউ নেই। সিগনালের অলস নিষেধ

অবচেতনার মধ্যে নিঃসঙ্গ সম্রাট। কুয়োতে অনেক জল, গভীর, শীতল—
ঢেউ নেই। করবীর পাতা কাঁপে একেলা বাতাসে, স্বপ্ন দেখতে
ভয় লাগে এ সময়ে, খা খা প্লাটফর্মে আর কিছু নেই, সারাদিন
উচ্চাশা, আদর্শ, প্রেম, যৌবন নামক সব দ্রুতগতি গাড়ির প্রস্থান...
শেষ ট্রেনে কেউ নামে নি, রাজধানী থেকে কেউ, অথবা করুণ
বিস্মৃত বান্ধব কোন কৈশোরের, উস্কোখুস্কো চুল কোন দুঃসংবাদ দাতা,
কিংবা বিড়ালের ভাগ্যে দৈবে কোন শিঁকে ছিঁড়বার বার্তাবহ।
আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে এক নিষ্ফল বিষাদ
একমাত্র পুত্রহারা নিরালম্ব বিধবার চীৎকারের মত।

বিসর্জনের আগে ॥

ক্রমশই জটিল পরিস্থিতি। যৌবন নামক
তৃষ্ণাগর্ভ শূন্যতার আলেয়ার ষড়যন্ত্রে ভুলে
নির্জনতা, আত্মরতি, ঘোড়দৌড়, নিসর্গকুহক
পরিত্যাগ করে একা পুরাতন বিষবৃক্ষমূলে
অন্ধকার উর্ণনাভ কর্তৃক ভুঞ্জিত হতে হতে
ভাসিয়েছি জীর্ণ উপহারগুলি সর্বনাশা স্রোতে।

মনে হচ্ছে যেন এই আসন্ন চরম বিসর্জন
অনুষ্ঠিত হবার আগেই কোনো নোআর জাহাজে
কয়েকটি ধ্বংসোন্মুখ প্রতিষ্ঠান, বিশল্যকরণ,
মহুয়াবনের চাঁদ, হরিনী ও মানবসমাজে
প্রতিকূল তরঙ্গে লালিত কয়েকটি গুপ্তকথা
গচ্ছিত রাখতে হবে। ক্রমশই বাড়ে জটিলতা।

শীতের বিকাল ॥

শীতের বিকাল জুড়িয়ে এলে পর
হাওয়ার হাতে ঝরা পাতার খেলা,
ছায়াবী ঘরে স্মৃতিমালার স্বর—
আবীর মেঘে ফুরিয়ে আসে বেলা।

শীতের বিকাল স্বার্থপরতায়
কাঁদায় শিশু আমার বাগান দ্বারে—
সেই পাপে যে ফুলেরা ঝরে যায়
সময় আমার যা-কিছু সব কাড়ে।

শীতের বিকাল পা রাখে চৌকাঠে,
অচিন পথে বাউল বাজায় বীণ,
ফসল কাটার পরে হলুদ মাঠ-এ—
উড়িয়ে ধুলো ফুরিয়ে আসে দিন।

শীতের বিকাল জুড়িয়ে এলে পর
বিসর্জনের বিষন্নতা বাজে,
ভাঙতে থাকে রঙিন তাসের ঘর—
মন লাগেনা নিয়মমাফিক কাজে ॥

হঠাৎ ডেকে ॥

হঠাৎ ডেকে সন্ধেবেলায় করিডোরে
বল্লে, 'আমার হৃদয় ভরা অসুখ এখন'—
বল্লে, 'তুমি সারিয়ে দাও সকল ব্যথা—'
হায়রে মেয়ে, আমি শুধুই কাব্য লিখি
কেমন করে বলবো তোরে 'নই বিধাতা'।

গুণিনের বীণা ॥

তিমির সঙ্কুল রাত্রি গান্ধারীর মতো এলোকেশী,
খুঁজে ফেরে মৃত সন্তানের মুখ। পরিচিত স্থির
নক্ষত্রেরা নিপতিত, শত্রুরা সকলে ছদ্মবেশী,
বন্ধুরা পুতুল মাত্র, ঘরে নিঃসঙ্গতা, পথে ভিড়।
নিসর্গ দুর্যোগঘন, বাসস্থান গুপ্ত জতুগৃহ।
'এখন কোথায় যাবো?'—প্রতিধ্বনি নিষ্ঠুর নিস্পৃহ।

ফিরিওয়ালার মতো সারাদিন সূর্য নগরীর
অলিগলি হেঁটে গিয়ে নিঃস্বতায় অন্ধকারে ডোবে,
নটিনী তিমিরময়ী, লক্ষ্যহীন পথের অস্থির
শিকার বিকার বকে' শেষকালে হাসপাতালে শোবে।
হৃদয় মৃগয়াকামী, গন্তব্য যে কোথায় জানি না।
বধিরের বড়ো শখ শুনতে সেই গুণিণের বীনা ॥

ঝড়েও নেভে না ॥

বিস্তারিত মেঘপটে অবসরে বিষাদের ছবি
আঁকা হয়। অথচ হৃদয়ে কত অগাধ বিষাদ
ছায়ার মতন ফেরে উৎসবে উৎসবে। এ পূরবী
সন্ধ্যার বকুলে কাঁদে, চলে গেলে রৌদ্রের নিষাদ।

দুঃখের অনেক রূপ, অভাবের বহু পরিচয়—
আমরা লবণ জল পাড়ি দিয়ে খুঁজি এক দ্বীপ
রৌদ্রোজ্জ্বল। 'সে দ্বীপ কোথাও আছে'—এই বরাভয়।
ঝড়েও নেভে না আছে বুকে সেই সোনার প্রদীপ।

'এ বিষাদ, এ উৎসব, মেঘ ও বিদ্যুৎ শেষ হলে
প্রগাঢ় আকাশ নীল'—প্রেম শুধু এই কথা বলে ॥

বিমল আলোর কাছে ॥

'বিমল আলোর কাছে আমরা কতো না ঋণী'—মনে হয়।
আষাঢ়ের মেঘাবৃত আকাশকে মনে হয় যেন
একটি নিমগ্ন পোত, অসহায় আমরা সকলে। মনে হয়
এই সব আদর্শ-সম্মান-শিল্প-ধাতুর ঝঙ্কার
আসন্ন বৃষ্টির কাছে অধুনা গচ্ছিত রেখে, বলাকার মতো
উড়ে যাই বিমল সে ছায়াহীন আলোর সন্ধানে।

অথচ যাব না। হাতে পায়ে অদৃশ্য সে ঊর্ণাজাল
অমোঘ শৃঙ্খল, রক্তে অভ্যাসের সতর্ক কিঙ্কিণী, আর
সঞ্চিত ইচ্ছার পাপ খেলা করবে, প্রবঞ্চিত প্রেমের আহ্বান
প্রতিহিংসায় বাজবে। ঘরে আসবাব, তৈলচিত্র, নারী
সব কিছু বদলাবে রঙ। উদার অ্যাসট্রেতে ছাই পাহাড়প্রমাণ।

হে আষাঢ়, রক্তের এ মেঘান্ধতা দূর করো নির্মম বর্ষণে।

অলৌকিক বীণা ॥

কলম ধরলে হাত কাঁপতে থাকে, যেন ৩০২-এর আসামী।
আরেকটি হত্যার দায়—ডেটলে সাবানে হাত ধুই।
নির্জনতা নাম্নী এক ভূতে পাওয়া আধ যুবতীকে
একটি ভোট দিয়ে শেষে বিছানায় শুই
বাজারে' নারীর সঙ্গে—ভয়ে তার মুখও দেখি না।

বহুকাল শুনি না যে অলৌকিক বীণা ॥

নিয়তিকে ॥

মাঝরাতে টেলিফোন তুলে শুনি কার কণ্ঠস্বর—
এ জন্মে শুনিনি কোনদিন, অপার্থিব অথচ অমোঘ।
টবের গাছের রাজ্যে এলোমেলো হাওয়ার ডাকাত,
কালো একটা ট্যাক্সি বুঝি দরোজায় ওৎ পেতে থাকে।

টেলিফোনে বিপদ সঙ্কেত, হাসপাতালে শিশুর ক্রন্দন,
জননীর আর্তনাদ, অথচ আমার কোন জীবন্ত শিশুর
সংবাদ তো জানা নেই, পীড়িতা মাতার সমাচার।
ভিতরে দারুণ ভয় বেড়ালের মতন আঁচড়ায়। ঈশ্বর! (চীৎকার)

অবয়বহীন এক বিষ দের অধীনতা ; দাহ্য দেহ মন।
শারীরিক প্রক্রিয়া ও চেতনার বৃশ্চিক দংশন, অস্তিত্ব
জনিত ভার, ভবিতব্য বিষয়ে হতাশা...ইত্যাদির আক্রমণ শেষে
সকালের রোদ হতে ইচ্ছা করে শিশিরে আদুল স্নান করে।

হাসপাতালে যুগপৎ জন্ম ও মৃত্যুর ক্রন্দন, নিয়তি আমার।
টেলিফোনে ডাকতে থাকে মাঝরাতে, নিয়তি আমার।
আমার সকল পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে যেন বিচারক হবে,
মুক্তির প্রার্থনা তবু বিস্মৃত, হে নিয়তি আমার ॥

জীবনবাবুকে ॥

জীবনবাবু, এখন আমি কৃপাপ্রার্থী
না, না—চাঁদা টাদা নয়।
ঘা আপনার বাঘা কুকুর, আর গোঁফওয়ালা দারোয়ান—
একমুঠো ফুল তুলবো—একমুঠো ফুল
ফুলদানে রেখে সারাদিন জল দেব। আর দেখব।
একটি মাত্র কবিতা লেখার জন্য কিছু আয়ু মঞ্জুর করুন।

চড়ুই ও কাঠগোলাপ ॥

চড়ুইগুলি তাড়িয়ে দাও উঠোন থেকে,
চড়ুইগুলি তাড়িয়ে দাও ছায়ার থেকে,
আমার ভালো লাগে না স্মৃতির খেলা খেলতে,
আমার ভয় করে যে মনের পেথম মেলতে—
(ওগো) বুকের নীচে নিলাজ ঝর্ণা ঢেকে
আমি আর পারি না জুয়ার দান ফেলতে।

কুড়োস নে ঐ ছায়ার থেকে কাঠগোলাপ,
দুপুর রোদে কুড়োস নে —ঐ মধুর পাপ,
আমার ভালো লাগে না ফুলের মালা গাঁথতে,
আমার ভয় করে যে মালার ছলে বাঁধতে—
(ওগো) ত্বকের নিচে লুকিয়ে রেখে সাপ
আমি আর পারি না প্রেমের শোকে কাঁদতে।

চড়ুইগুলি তাড়িয়ে দাও উঠোন থেকে
দুপুর রোদ পালিয়ে যাক গন্ধ রেখে,
আমার ভালো লাগে না দুপুর রোদে জ্বলতে,
আমার ভয় করে যে মনের কথা বলতে—
(ওগো) চোখের নিচে অন্ধকারকে ঢেকে
আমি আর পারি না স্বর্গ পানে চলতে ॥

তোমাদের দেরী দেখে ॥
(সুপ্রিয় ঘোষ বন্ধুবরেষু)

তোমাদের দেরী দেখে আমি একা নির্জন বিকালে
অপেক্ষায় বসে আছি স্মৃতিকল্প হ্রদের সম্মুখে।
মেঘ থেকে রঙ ঝরে, কয়েকটি আলোর পাপড়ি
ক্রমশ বিদায় নিলে অন্ধকার লিলিথ-প্রতিমা।
তার পায়ে বয়সের আবেগের চিত্রল হরিণী
নিহত ব্যাধের হাতে। রক্তচিহ্ন ধূলিতে মলিন।
সকরুন হাওয়ার বেহালা কাঁদে, জানালায় ঐ
ঝাউয়ের সংসারে ভাসে নীল তারা লখিন্দর হয়ে।
অদূরে দিগন্তে কার প্রাচীন প্রাসাদ পুড়ে যায়!
এ হৃদয় জতুগৃহ। অন্ধকার ত্রিশূলের মত।
সে জাদু প্রদীপ নিয়ে ফিরলে না তোমরা এখনও,
উদ্দীপনাময়ী শিখা বুকের ভিতর রেখে জ্বলি।
অন্ধকার দেউলে জ্বলে আমার এ রক্তিম হৃদয়।
শিশিরে ভিজিয়ে পা, কুয়াশার মাঠ ভেঙে এসে
শিউলির মত হাসি শিশুমুখে, মায়ের মমতা,
ধানখেতে শিশির ও নারীর লাবণ্য···ফিরে পাবে ॥

দুপুরবেলা ॥

আহ্... শীতল পাটি বিছিয়ে দিব্যি দুপুরবেলা
ঘুমের আয়োজনটি ছায়ায় খোলা চুলে।
বেড়ালটা দিক সুরসুরি ঐ ফর্সা পায়ে—
চোখ বুজলেই চুরি হবে তালা খুলে।

তালার ওপর নামটি খোদাই-'স্মৃতিলতা'
পানের ঠোঁটে সহজসুখের পিচ্ছিলতা ॥

আমাকে ডেকো না ॥

ডাকে কোন সাংঘাতিক চিঠি নেই। হঠাৎ মাঠের মধ্যে ট্রেণ থামলে
পরিচিত কেউ নামে না আশ্চর্য সংবাদ নিয়ে, পড়ন্ত রোদ্দুরে
তস্করের পদধ্বনি বাজতে থাকে। সময় জুড়িয়ে আসে, কোন
উদ্দীপিকা রমণীর মুখচ্ছবি, সংগ্রামের প্রেরণা...ইত্যাদি
কিছু নেই অনুভবে। ক্যালেণ্ডার বিমর্ষ অভ্যাস। মনে হয়
নিদারুণ ব্যাভিচারে আকণ্ঠ নিমগ্ন হই। লাল নীল মাছ
কাচবন্দী ছিল ঘরে, এ মুহূর্তে হত্যা করি সব, অথবা
প্রচণ্ড বিক্ষোভে এক আগ্নেয়গিরির মত কলকাতা নামক নগরী
মুহূর্তেই বিপর্যস্ত করে এক মেঘাচ্ছন্ন অলকা অপ্সরী
সৃষ্টি করি। শিরিষের মগ ডালে লাল ঘুড়ি বন্দীর মতন।
সময় জুড়িয়ে আসে চারিদিকে, উত্তেজনা অনুভব করি নিদারুণ,
হা ঈশ্বর, এখনি ডাক্তার আসবে, পুলিশ ডাকবে, দমকল...
সুতরাং বিছানায় ফিরে যাই, সারাদিন আমাকে ডেকো না।

লিজের প্রস্তাব ॥

চশমা নিয়েছ কবে ? কাগজে তোমার লেখা পড়ি।
চা খাবে তো ? ছাখো তো শহরে আজ কি দারুণ ভীড়—
দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। মিথ্যে দিনরাত ছুটোছুটি করি।
বাস্‌ষ্টপে দাঁড়িয়ে ভাববো কোনখানে যেন মাধবীর
নোতুন বাসাটা ?—অসম্ভব। রোগ ভোগ, দেনা, মনস্তাপ,
শোক, ক্ষতি বিনিময়ে অর্ধশতাব্দীর এক লিজের প্রস্তাব।

অন্ধকারের গন্ধরাজ ॥

অন্ধকারের গন্ধরাজ হাওয়ার হাতে দোলে,
শিশিরভেজা সুরভি যেন কাঁদে।
নির্জনতার ভিতর ঘরে ছদ্মবেশ কে খোলে!
হৃদয় ভাসে অজানা আহ্লাদে।

অন্ধকারের গন্ধরাজ আমার বুকের পরে
চোখের জলে কখন যায় ভেসে!
এ-ফুল আমি রাখবো কোথায় আসন্ন ঐ ঝড়ে,
দেব যে কারে, ভুবনে আছে কে সে ?

অন্ধকারের গন্ধরাজ দুখের রাতে কাঁপে,
প্রণয়ে তার ময়ূরী ওঠে নেচে।
ছুঁই না তাকে, ঝরে সে যদি শরীরগত পাপে—
সুরভিহীন কি হবে আর বেঁচে ?

প্রতীক্ষায় আছি ॥

প্রতিভাহীনশিল্পের মতো সাধারণ সময় চার দিকে।
পাখির ডাক, রোদ্দুর, অপ্রসন্ন হাওয়া ইত্যাদি এবং
এলো মেলো বস্তুপুঞ্জের ঢেউ, মাঝখানে আপন্ন নৌকায়
আমি তবু শুয়ে থাকি। ঝর্ণাতলে শুয়ে থাকে রঞ্জিত পাথর।
'প্রতীক্ষায় আছি,—সর্বদাই মনে হয়, অসন্তুষ্ট, লোভী।
অন্তপুরে তীক্ষ্ণ সূঁচে কে যেন সেলাই করে, দূরে
কৃত্রিম অলীক মেঘে ক্ষণস্থায়ী রৌদ্রের বাহার।

মেঘের দিনে : গন্ধরাজ ॥

লেবু গাছের পাতা দুলছে সজল হাওয়ায় ঐ
টিয়ে রঙের সাড়ি আনো তারের থেকে ছাখো
মেঘ করেছে মেঘ করেছে মেঘ।
হাওয়ায় জলে মাতামাতি ছাদের কোণে বুঝি
টবের বাগান ভাঙলো ঝড়ে, ঝড়
ছুটছে যুবক অশান্ত আবেগ।

উড়ছে পাতা, উড়ছে ধুলো, তুমি
পথের থেকে এসো, বুকের পরে
আছাড় খেয়ে কাঁদবে যখন সিক্ত এলো চুলে

তখন আমার হৃদয়লীন গন্ধরাজটি দেবো—
বৃষ্টি শেষের আলোর মত, স্মৃতির মত রেখো—
রোদের রাখাল এলে না হয় আবার রেখো তুলে ॥

চাঁপার গন্ধে ॥

কেউ ছিল না কাছে পিঠে ভর দুপুরে
বুকের কাছে ছিলে তুমি। হাত বাড়িয়ে
হাত যে ছোঁবো, পারি নি তা। হয়তো কেহ
অবিশ্বাস্য ভাববে—যেন মৃতদেহ
ছিল একটা মধ্যখানে ঠায় দাঁড়িয়ে।

চাঁপার গন্ধ ছিল শুধু ঘরটি জুড়ে ॥

চড়ুইভাতির পর ॥

কলাপাতা, ইটের উনুন, মাটির গেলাশ, কাগজ, ছাই
ফেলে এলাম গাড়ির পিছে,
'আর কিছু কি?' ভাবতে যাই।
নাগকেশরের লতা তখন দোলায় মাথা,
বলে 'না না,—
সভ্য মানুষ কাব্য লেখো
মন-হারানোর অনেক মানা।'

জলের ওপর সূর্য নাচে, পাথরগুলো ঘুড়ুর হয়,
অনেক গোপন নির্জনতায়
রুদ্ধ হৃদয় প্রলাপ কয়।
ঝরনা তখন বর্ণালিময়, মুচকি হেসে বলে 'না, না,
সভ্য মানুষ কাব্য লেখো
ঝরনা হতে অনেক মানা।'

'বরং ভালো, যাও ফিরে যাও তোমার রঙিন তাসের ঘরে।
এ-অন্ধকার তালার চাবি
আরেক কর্মকারই গড়ে।'

অনেক পাখি আপন মনে গাইছে বনে, 'না, না—না, না—
সভ্য মানুষ কাব্য লেখো
ময়না হতে অনেক মানা ॥'

নগরী নির্জন ॥

নগরী নির্জন হলো, নির্জন নগরী।
এলোচুল খোঁপা করো, টিপ পরো মেয়ে,
নগরী নির্জন হলো, চারিদিকে চেয়ে
এবার একেলা ঘাটে ডুবাও গাগরী।
জলে কত ছায়া পড়ে, ছায়ার মিছিল।
সব মেঘ কেটে গেলে আকাশ তো নীল।

আঁচলে জড়িয়ে রেখে হলুদ বিকাল
সন্ধ্যার সমাধি পরে কেন রাখো ফুল?
হাওয়ার নির্ঝর ডাকে, মায়াবী মরাল—
যেও না, যেও না যেন, মেলে এলো চুল।
এলো চুল খোঁপা করো, চোখের কাজল
দেখো, যেন না ভাসায় ও চোখের জল।

অমন একেলা ঘাটে ডুবিয়ে গাগরী
অচেনা ব্যথার সাথে কেন করো খেলা—
প্রদীপ জ্বালিয়ে চোখে জাগো বিভাবরী,
হৃদয়ে বিছিয়ে রাখো ছায়া সারাবেলা।
নগরী নির্জন, প্রিয় আসে অভিসারে;
দেখো, যেন কালনাগে না দংশায় তারে।

নগরী নির্জন হলো, নির্জন নগরী।
অসতী হৃদয় নিয়ে বলো না কি করি!

ভালোবেসে ॥
(দীপুকে)

তিনটে তাস হাতের আড়ে মুচকে হাসে—
'ফেলো না দান'—বুকের ভিতর দুরুদুরু।
দেবদারু গাছের নীচে কেমন ছায়া!
(হাতের মুঠোয় ধরতে গেলে পালিয়ে যাবে)

বলো না কি তাস যে আছে পাথর-চাপা—
চোখ মটকে হাসুক প্রতিবেশিনীরা,
দুরিতিরি সিংহাসনে পা নাচাক না,
রঙের বিবি সন্ধ্যাবেলা কেঁদে ভাসায়।

কেউ বা খাঁচার টিয়া ওড়ায় ভালোবেসে ॥

মাছখেলা ॥

সারাটা দিন রোদ মাথায় জলের পাশে বসে থেকে
বিকেল বেলা উঠলো যখন সোনালি রুই।
বাদাম গাছের তলায় বসে রগড় দেখতে
ছিল যে রোগা শ্যামলা মেয়ে উঠলো কেঁদে ঃ
'দোহাই তোমার, দাওনা ছেড়ে, দাও না ছেড়ে'।

সারাদিনের ফসলটুকু এক কথাতে
জলে ঢেলে লোকটা তখন শহরমুখী—
জোয়ার জল কখন তার গাছতলাতে
কালোমেয়ের পা দুটি ছোঁয় অবলীলায়—।

বুকে নিয়ে সূর্যোদয় ॥

বেদেটাকে দেখি সারাদিন, ভালুক নাচায়।
রঙ্ ওঠা তিনটা বল এক হাতে লোফালুফি করে।
গাছের ছায়ায় তার এনামেল মগে টুং টাং
কখনো বা পয়সা পড়ে। শীতের রাত্তিরে
তাকেই যখন দেখি রাজ্যের কাগজ পাতায়
আগুন জ্বালিয়ে তাতে হাত সেকতে-ভারী হাসি পায়
কেননা, উল্‌কিতে তার বুকে আঁকা আছে সূর্যোদয়।

জামা খুলতে ভয় লাগে, তাকাই না বুকের কপাটে,
ডাক নাম ধরে যেন কে ডাকছে ভিতর বাগানে ॥

তিস্তা-তীর বাসী-কে ॥

তিস্তা প্রিয়সখী, সহসা মেঘডম্বরুতে ব্যাকুল
উতল হলো। পাহাড় ছাখো ঢাকলো কালো মেঘে।
জানালা বন্ধ করো যুবক। ঘর ভিজবে। ফুল
গন্ধরাজ ভিজবে বুকের তলায় বৃষ্টি লেগে।

তিস্তা প্রিয়সখী, ভাঙবে এখন, ডাকবে গাঢ়স্বরে—
ঘাঘরা দুলবে, ঢেউ ছড়াবে। আকাশ মগ্ন পোত।
যুবক তোমার উঠোন ভেজে, অন্ধকার ঘরে
ভাঙন-ভীরু অবক্ষয়ের প্রবহমান স্রোত ॥

ঝড়ের পরে বৃষ্টিধারা ॥

কোন ফাঁকে যে দেব ফাঁকি!
চৌকিদার কি জেগে নাকি?
কেউ জাগে না অতীত ছাড়া,
মাঝে মাঝে ডাকে পাখি।

কেউ জাগে না অতীত ছাড়া
এলোকেশী পাগল পারা,
আঁধার বুকে যে- জোনাকি
কখন হবে ধ্রুবতারা?

আঁধার বুকে যে- জোনাকি
তাকে বলো কোথায় রাখি!
ডাকাত এলে দিই না সাড়া,
পাপীর মতো লুকিয়ে থাকি।

ডাকাত এলে দিই না সাঁড়া,
তকমা আঁটা নেই পাহারা।
লুঠ হতে আর নেই তো বাকী,
ঝড়ের পরে বৃষ্টিধারা ॥

গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা ॥

বুকের কাছে লেপটে থাকে বাদামী রঙ ঝরা পাতা
এলো হাওয়ায়। ধূলোর মতোন ঘূর্ণি নাচে হা হা হা—
বুকের ভিতর অস্তকালীন সূর্য নিয়ে নদী নিথর,
গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা 'কুলপী মালাই...ই' ফেরিওয়ালা
ডাকলে বুঝি ভালো ছিল, রাখলে হাতে গোড়ের মালা।
গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা এ শূন্যতার পরিত্রাতা
কোথায় আছে, বেতার যন্ত্র খুলে দিলে ঘোষক বলে ঃ
'ঝঞ্ঝা হবে বজ্র সহ আজকে রাতে'। কোথায় ঝড়
বৃষ্টি শুধু, মাটির গন্ধ, ঝরা বকুল কুড়োলো কে।
মধ্যরাতে চিলে কোঠায় কে উঠে আসে কাঁদতে একা!

আশ্রয় প্রার্থনা ॥

একটু আশ্রয় চাই
বড়ো ঝড় জল বাইরে।
পকেটে কিছু মূল্যবান
চিঠিপত্র বাঁচানো দরকার।
যাকে দেবার পাই নি তাকে।
আর,
সত্যি বলতে কি,
দেশলাইটা ভিজে না যায়,
একটি অন্ধকার ঘরে
আলো জ্বালবার কথা আছে আমার।
একটু আশ্রয় দাও,
বেনোজলে পা ডুবে যাচ্ছে ॥

দাঁড়ের ময়না ॥

শব্দগুলো মল বাজিয়ে নাচে
পুরোনো মল, আলতা রাঙা পা—
ধ্বনির ঢেউ ইতস্তত, কাছে—
গড্ডলিকায় ভাসিয়ে দিলাম গা।

হঠাৎ কখন জোয়ার-ঢল নামে,
ভাসিয়ে নিলো, ডুবিয়ে দিলো সব
পুরোনো তরী। প্রণয় পরিণামে
ঊর্মিমালায় ভাসে ভীরুর শব।

আমাকে দাও সেই সাবলীল ভেলা
বেহুলা গো, রক্তে নাচে বিষ।
শব্দ নিয়ে দোকানদারী খেলা—
এই ব্যভিচার ব্রত অহর্নিশ

ময়না আমার, ঢাকবো কত ত্রুটি।
ময়না দাঁড়ের দিলাম তোকে ছুটি।

ঝাউবন ॥

হৃদয় অবধি ছায়া প্রসারিত হলে পরে ঝাউবনে মুখ
আদরে আবৃত করে দক্ষিণ হাওয়া যে কেন হঠাৎ ফুপিয়ে
কেঁদে ওঠে, পিছে রেখে অস্তমিত সূর্য্যে আঁকা দূরান্তের গ্রাম।
হৃদয় অবধি ছায়া সচ্ছল ক্রীড়ায় নাচে, ইমনকল্যাণ প্রবাহিত

রহস্যমণ্ডিত ঐ আকাশের নরম গলায়। ঝাউবনে স্বাধীন পাখিরা
মনে ভাবে দুঃখ নেই কোনখানে, বন্দুকের শব্দ নেই, বারুদের
ঘ্রাণ!
কৃত্রিম ছায়াকে সৃষ্টি করে, তারপর, দুঃখ লাগে নিজের হাতেই
অযথা
হত্যা করতে, নষ্ট করতে সুযোগ সন্ধানী হাতে। বাইরের
বিচিত্রিত ছায়া
অলীক আশ্রয় দেয় কখনো বা। ছায়া নেই কোথাও নগরে, মৃত্যু
ছাড়া।
আলোকের স্বেচ্ছাচার চতুর্দিকে। কৃত্রিম আলোকমালা, বর্ণালী,
কুহক···
এমন আলুল কোনো ফালগুনের অপরিচিত এ দিব্য বিকালে হঠাৎ
হৃদয় অবধি ছায়া প্রসারিত। এ হৃদয় ঝাউবন হয়॥

সন্ধ্যার প্রতিমা॥

রেলিঙে হেলান দিয়ে সন্ধ্যার প্রতিমা—
কালো সাড়ি হলদে ব্লাউজ খোলা চুল চারদিকে তার,
থোকা থোকা অন্ধকার ঝুলে আছে আঙুরের মত
তার তনুলতা ঘিরে। এখনি যেন সে
হাত বাড়ালে অলৌকিক জ্বলে উঠবে হাজার প্রদীপ—
অবলীলাক্রমে সব ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে মন্দপায়ে
চলে যাবে ভিতরের ঘরে, তারপরে অন্ধকার
অন্ধকার হয়ে যাবে। ডায়মণ্ডহারবারে
ঢেউগুলো হা হা করে মাথা কুটছে পারে॥

নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর জন্য॥

কিশোর কালের বন্ধু আলোকসম্ভব
দেয়ালির সন্ধ্যাবেলা চুম্ করে বল্ল 'ওরে যাই,
অন্ধকার ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালাবো'—
সেই যে মিলিয়ে গেল জোনাকির ভিড়ে
আজও ফিরলো না।

অনেকে ফেরে নি আজও, ইতিমধ্যে
অন্ধকার ঘরগুলি হলো না তো দীপান্বিত, আজ
আলোকসম্ভবকে মনে পড়ে, যখন দেখছি
খড়ো চালে দাউদাউ আগুন জ্বলছে
মাঝরাতে।

অনেকে ফেরে নি আজও, ঝড়ের রাত্তিরে
নিরাপদ সঙ্কেতের জন্য যারা তুফান ঝঞ্ঝায়
আলোকস্তম্ভের মত নির্বাসিত, বুকে জ্বেলে আলো
দেয়ালির সন্ধ্যাবেলা জোনাকির ভিড়ে
মনে হয় আলোকসম্ভব
ফিরে আসবে, ফিরে আসবে চোখে জ্বেলে এক
আশ্চার্য প্রদীপ॥

সিঁড়ি নেই গোল ঘরে ॥

'বৃষ্টি এসে গেছে, চলো তাড়াতাড়ি'
বনতুলসীর ঝোপে ঐ গ্যাখো পড়োবাড়ী।
ও বাড়ীতে থাকতো কারা
কে জানে কার বা বাড়ী কে দেয় পাহারা!
তবু বিস্মৃতির বনস্থলী ভেদ করে কোন কোন বাড়ী
জেগে থাকে দু একটা কথা অদরকারী।
এ বাড়ীর সিঁড়ি নেই কেন শুধু অজস্র দরোজা
কোথাও পাথরচাপা রয়ে গেছে ফেরারী ফিরোজা।
এঘরে ঢোকে নি কেউ যায় নি কি ঘরের বাহির
রাজমিস্ত্রী সিঁড়িগুলো ভেঙে দিয়ে অসুস্থ অস্থির
পালিয়ে গিয়েছে ভয়ে। শ্বেত করবীর
গাছের নিচেই ঐ মসৃণ ছায়ারও নেই সিঁড়ি
অথচ সচ্ছন্দে জ্যোৎস্না অধিকার করে অশরীরী
ঐ গোলবাড়ী শ্বেতকরবীর বন পেয়ারাবাগান খোলা মাঠ—
যাবার সময় খুলে যায় হাজার কপাট।
আমি যাবো ও বাড়ীর ছাতে।
আর কে কে বলো যাবে সাথে ॥

মধ্যরাতের সংলাপ থেকে ॥

সভ্যতার শেষ অবধূত যাচ্ছে ঢাকা রাত্রির ফিটনে,
হাত তুলে ডাকলে কি হবে, সে থামে না—
হো হো হেসে লম্পটের মতন পালায়।
গ্যাস জ্বলা মদে চুর টলতে থাকা গলির ফটকে
কব্জির বোতাম খুলে জাদুকর স্মার্টকরে দেখাত যে হর্তন বিবিকে
বেষ্পতির বারবেলায় সে ও মধুপুর যাবে বলে গ্যাছে ইষ্টিসনে,
দাসী বাঁদী বেসেমিজ শুয়ে থাকে বারান্দায় বেলফুল জড়িয়ে খোঁপায়।
হেইরে ব্রাদার, কে যাচ্ছ জাহান্নমে
দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব···
মাইরি বলছি, ধরে রাখো, নইলে দেখো, ম্যানহোলে নির্ঘাৎ
ঝাঁপ দেবো— আজ, বিশ্বাসঘাতিনী আশালতা
অমৃত লেবেল দিয়ে চিরতার জল গিলিয়েছে। এঃ···
এত যে পিছল কলকাতার পথ, ভগবান
যদি থাকো দু একটা শিকড় দাও পায়ে, না থাকলে···! ?···
কর্ণের রথের চাকা ডুবে যাচ্ছে এ্যাই
ট্যাক্সি ট্যাক্সি···
আঃ, তুমি বাঁচালে প্রভু, কষে বাঁধো নোঙর দাঁড়াতে
পারছি না, বাঃ দিব্যি লাল পাগড়ি মাথে কেষ্ট ঠাকুর
লালবাজার? ইয়ার্কি করো না বঁধু, একটা প্রদীপ
দিতে পারো? দেখি মুখ, কে বট আপনি?

সারাবিকেল গোলাপী চুল ॥

সারাবিকেল গোলাপী চুল হাওয়ায় ওড়ে নাকে মুখে
গোলাপীচুল সারাবিকেল সারাবিকেল গোলাপী চুল আকাশময়
দারুণ ঘোড়া ছটফটায় দ্রুত হারায় ফিরে আসে সারাবিকেল
আলোয় আলো বুকের খোদল উপছে পড়ে সারাবিকেল
নকসা কাটা দরজা খুলে মোমের মতন হাতের ক্লেশ
সটান গাছের ছায়ার মধ্যে পাতাল প্রবেশ সারাবিকেল
গাছের ছায়ায় তারই জন্যে বসে থাকা গোলাপীচুল
বিলি কাটছে উড়িয়ে দিচ্ছে চুলের জাল সারাবিকেল
হাওয়ায় হাওয়ায় দারুণ ঘোড়ার মাতামাতি সফেদ সাদা
খড়খড়ি ফাঁক করে দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে পাখী কারা
শব্দবিহীন খালি ফ্লাটে বুকে বালিশ উপুড় বাটি
সারাবিকেল জানলা খোলা গোলাপী চুল সারাবিকেল

অস্থির দর্পণে মণিমালা ॥

অস্থির দর্পণ কাঁপছে বয়ঃসন্ধি কালের মেয়ের
উত্তেজিত হাতে, তুই কার মুখ দেখবি মণিমালা ?
বুকের ভিতর এক তোলপাড় দিঘি, কারা সাঁতরায় .. কারা ?

দেরাজে ঝুলিয়ে ছোট টিপতালা, বারান্দায় এসে
দেখলি তো পুলিশে পুলিশে তোর উঠোন ছয়লাপ !
(বরযাত্রী হয়ে এসে শব কাঁধে যাচ্ছে ওরা কোন্ অন্ধকারে)

অস্থির দর্পণে তুই কোন্ মুখ দেখবি ওরে হাওয়ার প্রদীপ !

রাণী হে আমার রাণী ॥

আমার বিছানা পুড়ে যায় তেজস্প্রিয়তায়। কার লালচুল !
কার লাল চুল দেখে আমি জাতিস্মর হয়ে যাই
'রাণী··· হে আমার রাণী···
জ্যোৎস্নার খুন খারাবি মাথাহাতে ঝাউবনে নৃশংশ রাহাজানি—
ওলট পালট হয়ে যায় সব কিছু শব্দহীন স্বেচ্ছাচারে সর্বত্র, হৃদয়ে।
ঐ জ্যোৎস্না মুক্তিপণ দাবী করে' হু-হু বাতাসের—
দামাল এত্তেলা দেয়। লালচুলে পুড়ে যায় আদিগন্ত আমার শরীর
'রাণী, হে আমার রাণী···'
লক্ষ লক্ষ আর্ত পাখি উড়ে যায় এক ফাঁদ থেকে অন্য সুখকর ফাঁদে
কোন ভ্রষ্ট প্রতিশ্রুতি কয়েদির মত শুধু বাঁধে
আজকে আমাকে। কার কাছে দিয়ে যাবো বলে
কথাদিয়ে এতকাল ভুল পথে চলে গেছি...কতোকাল...কতো বনবীথি
কত রাজপথ... আজ শুধু জোয়ারের জল ফুলে ওঠে—
ভেঙে ফেলে তমালের জটিল শিকড়, মাথা কোটে—
'ফিরে দাও আমার রাণীকে...'
ভরা কোটালের শত্রু কামান গর্জে ওঠে; তবু, রাণী, হে আমার রাণী
আমি চিনেছি তোমার লাল চুল ॥

অসতর্ক নারীকে ॥

অসতর্ক ছিলে তুমি নারী
হঠাৎ মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নার পিচকারি
তোমার নিরালা সিঁথি অসময়ে করে আলোড়িত।
জোনাকির লণ্ঠন জ্বালিয়ে কারা নিয়ে যায় শব ?
বুকের উপর মৃদু ঘামে কাঁপে কার করুণ শৈশব
তোমার বিনষ্ট চুলে দোলে আজ পূর্ণ পরাভব—
ভোর রাতে কারা এসে বাগানের সব ফুল চুরি করে নিতো ?
প্রহরীর ফ্রিজ ফটো, ধূলায় রক্তিম তরবারী—
অসতর্ক কেন ছিলে নারী ?
ধ্বংসের ভিতর থেকে শুনে যাও প্রতিশ্রুতি তবে
ধ্বংসের ভিতর থেকে আরেক উৎসবে
আমিও ফিনিক্‌স্ হতে পারি।

ধ্বনিময় জ্বরে ॥

ধ্বনিময় জ্বরে শুয়ে আছি। শুয়ে আছি।
বুকের উপর কুড়িয়ে পাওয়া ভুলে যাওয়া নূপুর যে কার।
মগজের ভিতর জুয়ার দানে ছিপি খোলার
আর্তনাদে উড়ে বেড়ায় ভাঙাচাকের মৌমাছি।
অমাবস্যার রাতে দোলন চাঁপার দ্রুত পেণ্ডুলাম
হাওয়া কাটে। জ্বরের ধুনুচিতে আভের গুড়ো ছুড়ে
তাঁর আচল চেপে ধরতে গিয়ে পুড়ে
গেলাম সর্বাঙ্গে যে, পুড়ে গেলাম। পুড়ে গেলাম।

মাঝরাতে রেসকোর্সের মতন নির্জন বুকে ধ্বনিহীন ঘোড় দৌড়।

একটা গুলির শব্দে ॥

একটা গুলির শব্দে এক ঝাঁক বালি হাঁস দিয়েছে উড়াল।
পশ্চিম আকাশের লাল
থেকে ঝরে পড়ে এক আঁজলা শ্বেত করবীর—
পবিত্র করুণা। আর বুকের গভীর
গভীর পাতাল থেকে প্রতিধ্বনি। বারুদের মেঘের আড়ালে
কোথায় সানাই বাজে। ডাঁহা ডাঁহা মিথ্যার মতন
গম্বুজের নিঃশব্দ পতন। নৌকাডুবিতে হারালে
চন্দনচর্চিত বরকনে, ভেসে ওঠে কামিনী কাঞ্চন।

কোলে নিয়ে গুলিবিদ্ধ একটি আহত পাখি
বসে আছি পাতালের দ্বার দেশে সিদ্ধার্থের মতন একাকী।
কাঁটাতারে ঝুলতে থাকা সৈনিকের চীৎকার দারুণ
একটা বুলেট বেচে আরো দেড় সের গম খরিদ করুন।
বুকের পাতাল পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি :
'একটা গুলির দাম কত আজকাল ?'
একটা গুলির শব্দে ডুকরে ওঠে বত্রিশ রমণী
বাঁ হাতে গোলাপ পিষে। মাঝিদের 'সামাল···সামাল···' ॥

স্বগতোক্তি ॥

জানি জানি রাহাজানি হত্যাকাণ্ড,
তবু চাবি পাবে না সেই সিন্দুকের।
আমি বসে দেখছি চোরের ক্রিয়াকাণ্ড।
(ভয় করেনা যৌবন ও নিন্দুকের ?)

খোঁপায় দিয়ে মাদার ফুল কি প্রকাণ্ড
আই বুড়োরা সেই যে গেল হাটের পথে
দরাদরি করে শেষে মধুভাণ্ড
মাথায় ভেঙে ফিরলো ঘরে কোনমতে।

মোহর করা কৌটাতে সে চাবি আছে
খোদাই করা আছে তাতে রক্ত পদ্ম,
চৈত্র মাসে বুকের খুন গাছে গাছে—
(ভালোবাসতে গিয়ে এবার কেমন জব্দ?)

ছাখো ডাকাত সেই তো নিল পার্থিবতা
হাওয়া নেবে এখনি তোর সুরভিটুক।
জ্যোৎস্না রাতে কাঁপন লাগা কটি কথা
বাঁচিয়ে রেখে ভরিয়ে দেব শূন্য বুক ॥

শেষ চার মিনার ॥

এক একটা মিনার ভেঙে পড়ে।
স্থপতি ও ভাস্করের হৃদপিণ্ড প্রচণ্ড আওয়াজে
বিস্ফোরিত হয়ে গেলে ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর ওড়ে
নিরাশ্রয়, সন্ধ্যার আকাশে। আমি দূর থেকে
বাজি ধরতে থাকি ঠিক পরবর্তী মিনার বিষয়ে।
এক একটা পাগল কিংবা গাইড বিড় বিড় করে
কি সব মন্ত্রের মত কথা উচ্চারণ করে চলে যায়!
রাশ রাশ এলোমেলো জোনাকির ভঙ্গুর সভায়
অন্ধকার পাদ্রীর প্রার্থনা সন্ধ্যার বাতাসে ; আমি
অসহায় পকেট হাতড়াতে থাকি, ফিরে যেতে হবে
নির্দিষ্ট সময়ে তাই টাঙ্গাওলা নিকটে মজুত।
(··থেকো··· তুমি থেকো···)

এক একটা মিনার ভেঙে পড়ে।
শব্দের তোলপাড়ে
কেঁপে ওঠে দূর গ্রামে ছায়াময় দিঘির নিরালা—
আমি জানি ত্রিশূলের মত ঐ অন্তিম মিনার
অবিশ্বাসী নয়, তাই বাজি আর ধরি না, কারণ
তিনটে মিনার গেছে ইতিমধ্যে—তিন লক্ষ পোষা কবুতর—
তবু আমি ধৃতরাষ্ট্র আছি।
(···থেকো··· তুমি থেকো···)

রক্তিম মেঘের মায়া রুমাল যখন
নদীর ফোঁপানিটুকু মুছে দিতে চায়, নির্বিকার—
শেষ চার মিনার আমি দাউ দাউ জ্বালাই প্রদোষে ॥

লণ্ঠন জ্বালাতে ॥

দরদালানে সারি সারি ঝাড় লণ্ঠন
এক ফুঁয়ে নিভিয়ে কখন
খিলখিলিয়ে মূর্চ্ছা যেতে যেতে
তুলতুলে হাতে চোখ চেপে
পিছনের থেকে বলা 'বলো তো কে ?'
বলো তো কে ?
আতরের প্রচণ্ড দাপটে অন্ধকারে হাজার হাজার
বেলুনের উড়ে যাওয়া, গমগমে হাটবাজার
ভেঙে দিয়ে ছুটে চলে যায় ভাদ্রের কীর্ত্তিনাশা—
যেন চালকবিহীন এক গোঁয়ার এক্সপ্রেস ছুটে যায়—
দাবানলে কৃষ্ণসার ছোটে আর
ছুটে যায় পাগলের মতন চীৎকার
বলো তো কে ? বলো তোকে ?

চিনি তোরে চিনি রে ডাকিনী
রাত জেগে সব কটি লণ্ঠন জ্বালাতে তবু আসি ॥

বিকালের আলো দেখলে ॥

আঁচল দোলাতে থাকে বিকালের আলো।
চুল বাঁধা শেষ হলে
স্নো ক্যামেরা
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকালো
সেই মেয়ে বড়ো খোঁপা উত্তোলিত হাত আর
নিরাপদ বুকের কুহক
ঘুরন্ত চাকুর মত লাল দুল···এই সব ভদ্রভাবে দূর থেকে দেখা যায়
তারপর আরো ভদ্রভাবে সব ভুলে যাওয়া খুবই সমীচীন।
কিন্তু ছাখো পর্বত প্রমাণ ন্যাপথলিন
বড়ো মিষ্টি গন্ধে এই সব ঢেকে রেখেছিল এতদিন।

সেই মেয়ে ঘোরালো সিঁড়ির সব রহস্য উজাড়
করে চলে গেছে বুড়ী হতে, তার
দণ্ডাদেশ কে শুনেছে! শুপুরি বাগিচা ভরা দুপুর বেলার
হাহাকার কে শুনেছে! দণ্ডাদেশ রদ করে দিয়ে
তাকে নিয়ে আসা যায় প্যারোলে পূজায় মধুপুরে—
ব্যর্থতার সেবাদাসী কাঁদে শূন্য মন্দির চত্বরে—

বিকালের আলো দেখলে আমি খুঁজি চৌকস সাপুড়ে ॥

ট্রানজিস্‌টার মেঘলাদিনে ॥

মেঘলা দিনে ট্রানজিস্‌টার কোথায় যেন বাজতে থাকে
'ফিরে এসো ফিরে এসো—দূরে গিয়েই ভুলে গেলে !'
ভুলে গেলে সে সব ছবি, সে সব কথা-ভরদুপুরে
ঝাঁপি খুলে দেখতে আমায় এমন একা রেখে গেলে !
শিউলি চারা জানলা ঘেঁষে, এই পুজোতে ফুল ছড়াবে
বলেছিলে ফিরে এসে পড়ো বাড়ি ফের গড়াবে—
তেলকুচো লতায় এখন ছেয়ে গেছে সারা উঠোন—
ট্রেনের সময় হলে আজও দাঁড়িয়ে থাকি প্রদীপ জেলে···
ফিরে এসো ফিরে এসো ছলছলিয়ে বৃষ্টি নামে।

ফিরবো আমি তোমার কাছে পরশপাথর খুঁজে পেলে
ফিরবো আমি তোমার কাছে তাইতো পাগল হয়ে ছুটি
ফিরতি পথে জানো না তো রোজই একটা দুর্ঘটনা—
উল্টে থাকে মোটর গাড়ি, থেৎলে থাকে শিশুর মুখ—
ড্রাইভারেরা শুঁড়িখানায় আড্ডা দিচ্ছে জুয়া খেলে—
মেঘলা দিনে কোথায় যেন...কোথায় যেন মেঘলা দিনে।

অনুতাপের শাকের আঁটি উটের পিঠে জমতে থাকে—
কল্পিত এক বেদীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসলে পরও
টেরিলিনের ভাঁজ ভাঙে না—সভ্যতা খুব দুরস্ত।
মেঘলা দিনে ট্রানজিস্‌টার বাজতে থাকে কোথায় যে
'ফিরে এসো, ফিরে এসো, প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলে !'

ভুল খবর ॥

মাঝরাতে ফায়ার ব্রিগেড এসে তাজ্জব বেকুব
কোথাও আগুন নেই, ধোঁয়া নেই—কি সুন্দর ছিমছাম বাড়ি
দু দুটো কুকুর নিয়ে গোয়েন্দা লাফিয়ে পড়ে—
কোথায় খুনের বাড়ি—দিব্যি যে রেডিও বাজে; নিয়নে দীপালি !
রক্তপাত কে ঢেকেছে চিত্রিত কার্পেটে, আগুন
কে রেখেছে লুকিয়ে—ভুল টেলিফোনে কে দিলো খবর !

আমি কি জানি মশাই, আমাকে বৃথাই জেরা করা—
এই দেখুন না ঝকঝকে কার্ডে নেমন্তন্ন চিঠি—সভাপতি
হয়ে ছুটে আসছি—মহারাণীর মৃত্যু বার্ষিকীতে নাকি
সভা ও কবিতা পাঠ হবে।

একটি শিশুর জন্মকালীন ॥

(৭।৯।৬৪)

অসহনীয় শূন্যতার প্রোথিতমূল কালো
একটি শিশুর প্রথম হাসির প্রদীপ, মাগো, জ্বালো।
ভিড়েও সিংসঙ্গ কেন, নিস্তরঙ্গ মৌন—
একটি শিশুর কান্না রচে সাম্রাজ্য অগৌণ।
ঝড়ের লুট সাঙ্গ হলে আবার ও এই মঞ্চে
পাখির গান, শিশুর মুখ প্রস্ফুট মালঞ্চে।
রক্তক্ষরা মেঘের হৃদয় উৎসারিত আলো—
অপাপবিদ্ধ অস্রাবির পবিত্রতা জ্বালো ॥

কালিঝোরা ॥

রমণী হঠাৎ
শেভক ব্রিজের মুখে বাঘ দেখে খুব ভয় পায়।
তাকে যতো বলি 'মামুলি পাথুরে বাঘ' সে শোনে না
যেন মূর্ছা যায়। আমি তাকে নষ্ট করি নাই।
তারপর অনাবিল জ্যোৎস্নার রাত—
কালিঝোরা বাংলায় বনের বাঘের দর্শন—সে রমণী
খিলখিলিয়ে হেসে বলে 'যাই বলো মানিয়েছে বেশ। যৌবনের হাতে
টোটা ভরে তাক্ করে ছুড়তে গিয়ে গুলি
হাত কাঁপতে থাকে কেন। হাজার হাজার বন্দুকের
কালো মুখ আমার বুকের দিকে। ততক্ষণে
শালবনে জ্যোৎস্না পিঠে চলে গেছে তরাইবাসিনী।
হরিণের খুলি, মর্মভেদী শিঙ দুটি বারন্দার শোভা—এরও
পিচ্ছিল ক্ষুরের শব্দ বেজেছে কি জ্যোৎস্নার রাতে, এরও
অলৌকিক মৃগনাভি ছিল ঐ ত্বকের গভীরে? হরিণের ছাল
কৌচের আচ্ছাদন। এরকম রাতে
হাতের কাছেই অগ্নিবলয়ের মত সেই নারীর কোমর, আর
দুব্যারেল রাইফেল, দেরাজে জিনের ভাণ্ড এখনো নিটুট—
আমি বসে থাকি ভ্রষ্টলক্ষ্য, যেন আশৈশব
বসে আছি, বন্ধুরা সকলে
ছুটে গেছে নানা দিকে সৌভাগ্য সন্ধানে। তিস্তার ওপারে
নলখাগড়ার বনে উদ্বাস্তু বাঘিনী চলে গেছে—মনে মনে
তাকে খুন করবার মতবল আঁটি। একটি মৃত্যুর কাছে

ঋণী হতে থাকি। রমনীয় যৌবনের মত
তিস্তা ঘর-ভাঙা মেয়ে ছুটে যায়, আমার মুঠোর থেকে দূরে।
শেভক ব্রিজের বুক থেকে
জ্যোৎস্না রাত লাফ দিয়ে মরে যায়। আমার মুঠোর থেকে দূরে
সে রমণী চলে যায়। প্রখর দুপুরে

পাহাড়ি বস্তির পথে মহিষাল নাচে ধুলো মেখে।

কালিঝোরা বাংলায় প্রত্যেক প্রাবৃটে
গিয়ে থাকি। শহরে সয় না—একটা প্রাচীন বাঘ—রয়াল বেঙ্গল
আমাকে কেবলই ডাকে—ধ্বংসেরও এমন মোহ হয়!
নিচে নদী খরস্রোতা, অদূরে পাহাড়ে
মৌসুম মেঘের কেলি, দেওদারবীথির শিখরে
বুনো ঝিঁঝিঁ সারাদিন ডাকে। বারান্দার ধারে
ঝুলন্ত অর্কিড, ক্যাকটাস। জানালায় আকাশিয়া মুখ ঘসে,
উঠানে শিলীন্ধ্র কুঞ্জ, বুকের ভিতর
পৌরানিক মন্দিরের গন্ধ জেগে ওঠে—চিরকাল ভ্রষ্টলক্ষ্য—
কার জন্য বসে থাকি, কুটজ কুসুম করপুটে!
বহু ব্যবহৃত নীল বেতের চেয়ারে বসে বসে
আলুথালু বৃষ্টি হলে সারাদিন রেকর্ড বাজাই।

হঠাৎ চমকে উঠি। পোষা সম্বরের দ্রুপাদাপি—কোথায় বন্দুক!
রক্তমুখী বাঘ সেই—কাছে এসে হেসে ওঠে হাহা,
কাঁধে থাবা রেখে বলে, 'কি হে বৎস কোন দুখে দুখী,
এক পাঁট গেলাতে পারো, ওস্তাদ? বুকটা

থাক্ হয়ে গেছে নরনারী খেতে খেতে।   সকলেরই বুকে
লুকানো দুঃখের এ্যাকোনাইট অনেক হজম করতে হয়, মেজাজ খারাপ।
একটা সন্ন্যাসী আছে কলকাতা, তার বরে
মেনী বেড়ালেরা নাকি এখন হালুম করে ডাকে।
কালি ঝোরা ডাক বাংলা ভে[illegible] শ্রাবণের ধারে।
কুবেরের শাপে বুক এ্যাসট্রে [illegible] যায় একেবারে।

এখনও বাঘের জন্যে বসে থাকা জনারণ্যে—
আমি যাকে ভালোবেসে জ্যোৎস্না রাতে রেখে দিয়ে গেছি অবিকল
তাকে আজ কারা যেন ভোগ করে, নষ্ট করে।
কেটে কুচি কুচি করে চোখ, ঠোঁট, বুক, হাত, উরু ও হৃদয়
কালো বাক্সে ঠেসে দিয়ে প্রত্যহ পার্সেল করে আমার নামেই।
তিস্তার ভাঙন রোধে একদল ইঞ্জিনিয়ারের সভা রোটাণ্ডায় বসে—
নিমন্ত্রণ চিঠি পাই।   আমার চৌদিকে তিস্তা এলোকেশী—
পাশের ঘরেই কে নারী উপুড় হয়ে কাঁদে!
দু'বুকের ভারে তার বনকেতকীটি মরে যায় বিনা অপরাধে॥